মঙ্গা এবং ক্ষুদ্র ঋণের দারিদ্র্য বিমোচন

আনু মুহাম্মদ

'আমি যখন দরিদ্র মানুষের মাথায় হাত বুলাই বা মুখে একটু পানি তুলে দেই বা তার জন্য কাঁদি তখন তারা আমাকে বলে সাধু বা দরবেশ, কিন্' আমি যখন দারিদ্র্যের কারণ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করি তখন তারা আমাকে বলে কমিউনিস্ট।'

-ব্রাজিলের ধর্মযাজক হেলডার কামারা

ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস যখন নোবেল শান্ি- পুরস্কার পেলেন তখন তা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ে- আনন্দ উ"্ছ্বাসের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে মঙ্গা চলছিল, চলছে এখনও। একজন বাংলাদেশীর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের উ"্ছ্বসিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনেক বাংলাদেশীর দশ ফুট লম্বা হয়ে যাওয়া বা বুকের ছাতি বড় হয়ে যাওয়ারও যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। অন্-ত যেরকম হীনমন্যতাবোধে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত আক্রান্-, যেরকম ছোটমুখ করে থাকতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বাধ্য হন সেখানে এই নোবেল শান্ি- পুরস্কার তাদের একটা দাঁড়াবার জায়গা দিতে পারে বটেই।

তবে এই আনন্দ-উ"্ছ্বাসের জোয়ারে কিছু প্রশ্ন আপাতত চাপা পড়লেও একেবারে মুছে যায় না। বারবার আসতে থাকে। মঙ্গার খবরাখবর সেই প্রশ্নকেই ঠেলেঠুলে সামনে আনতে চায়। প্রশ্নটি হল, যে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ণ অবদানের কথা বলে ড. ইউনুসকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হল সে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রকৃত চিত্রটি আসলে কী? তার পুরস্কারপ্রাপ্তিতে উ"্ছ্বসিত সংবাদ মাধ্যম আর সুশীল সমাজ এক পা এগিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক মডেলকে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সফল এবং অপরিহার্য পথ হিসেবে উপস্থিত করছেন। ক্ষুদ্রঋণ মডেল দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আসলে কী ও কতটা ভূমিকা পালন করতে পারে এ বিষয়টি তাই এখন অধিকতর অনুসন্ধান দাবি করে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের প্রবক্তা হিসেবে মুহাম্মদ ইউনুসের নাম বহুদিন থেকেই জোরেশোরে উ"্চারিত হ"্ছ, বিশ্বব্যাপীও তার পরিচয় সেভাবেই, যা এখন আরও অনেক জোরদার হয়েছে। কিন্' এর দাবিদার আরও আছেন। বাংলাদেশে এনজিও জগতের মধ্যে এই ক্ষেত্রের একজন বড় দাবিদার হলেন ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক। এছাড়া ভারতে আছে সেলফ এমপয়েড ওমেন এসোসিয়েশন বা সেবা। এরাও প্রায় কাছাকাছি সময়ে ক্ষুদ্রঋণ মডেলে কাজ শুর" করেছিলেন। আরও পেছনেও যাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে পলী উন্নয়ন একাডেমি ৬০ দশকেই ছোট ছোট গ্র"পে

ঋণ দেয়া ইত্যাদি শুর‘‘ করেছিল। তাছাড়া গরিব জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে-ই টিকে থাকার একটা কৌশল হিসেবে ছোট ছোট তহবিল সংগ্রহ, সঞ্চয়, ব্যক্তির সংকট আর ব্যর্থতার মুখে একধরনের সমষ্টিগত উদ্যোগের নানা ধরন দেখা যায়। গ্রামীণ ব্যাংক মডেল এগুলোর ধারাবাহিকতাতেই দাঁড়িয়েছে।

তবে ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংকের কৃতিত্ব বিশাল। যেভাবে ইউনুস শূন্য থেকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এরকম একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়া গড়ে তুলেছেন তা সত্যিই অসাধারণ। শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বিশ্বব্যাপীই এটি তাই বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, যার সর্বশেষ প্রকাশ নোবেল পুরস্কার। আমার বিবেচনায় মুহাম্মদ ইউনুস নিজে যা ভেবেই শুর‘‘ কর‘‘ন না কেন, গ্রামীণ ব্যাংক বা ক্ষুদ্রঋণের প্রাতিষ্ঠানিক এই সফল বিস্-ার বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং জগতে এক বড় মোড় পরিবর্তন এবং লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগে এক অনন্- সম্ভাবনাকে উপস্থিত করেছে। বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় উৎপাদনশীল খাতের যা প্রবৃদ্ধি তার থেকে হাজারগুণ বেশি বেগে লাফিয়ে লাফিয়ে এগু”ছ অর্থকরী খাত। ব্যাংক, বীমা, শেয়ার বাজার ‘টাকা টাকার জন্য’– বিনিয়োজিত হ”ছ অনেক উ”চহারে, মুনাফা সেখানেই বেশি, মাঝখানে ফাঁকা। কিন' উৎপাদনশীল খাত থেকে বেশিদুর লাফিয়ে গেলে যে বিপদ হয় তার চাপ ইতিমধ্যে মেক্সিকো, পুর্ব এশিয়া, ব্রাজিল হয়ে পুরো বিশ্বের বহুদেশ বুঝেছে। কিন' উপায় কী? মুনাফার হার সবচেয়ে বেশি যেসব খাতে, সেগুলোর মধ্যে মারণাস্¿, মাদকদ্রব্য, বিনোদন সাম্রাজ্যের পাশাপাশি এই অর্থকরী বিনিয়োগ। কিন' অর্থকরী বিনিয়োগও একটা সীমাবদ্ধতায় আটকে যা”ছল। বাজারের সীমা, আদায়ের সংকট, ঋণখেলাপি, দুর্বৃত্তদের ‘সীমা অতিক্রমকারী’ কর্মকাণ্ডে দেউলিয়া হয়েছে একের পর এক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র।

গ্রামীণ ব্যাংক মডেল এরকম অবস্থায় এক আশার আলো। ঋণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের অসীম সম্ভাবনা, বিশাল বাজার তৈরি, ঋণ আদায়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি তার ‘মানবতাবাদী’ চরিত্র; এরকম এক মডেল বিশ্বের তাবৎ বিনিয়োগকারীর জন্য তো বড় অবলম্বন হবেই। এই উপলব্ধি আন্-র্জাতিক ক্ষেত্রে পরিষ্কার বোঝা যায় মধ্য ৯০ দশকে। সে জন্যই ১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাংক ক্ষুদ্রঋণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয় এবং একটি তহবিলও গঠন করে। ১৯৯৭ সালে ওয়াশিংটনে প্রথম ক্ষুদ্রঋণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিশ্বব্যাংক, ইউএসএইড, ইউএনডিপি এবং সিটিব্যাংক সবাই বিশেষ কর্মসুচি ও বিনিয়োগ তহবিল গঠনের কথা ঘোষণা করে। এরপর থেকে মুল ব্যাংকিং ধারায় এটি সম্পৃক্ত করার নানা আয়োজন চলতে থাকে। এর দশ বছর পর শুধু যে গ্রামীণ ব্যাংক মডেল বহু বহু দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই নয়, মুলধারার ব্যাংকিংও ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি গ্রহণ করার আয়োজন করছে।

অর্থকরী বিনিয়োগের এই নয়া প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব অবশ্যই ড. ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাপ্য। সে হিসেবে অনেক আগেই মুহাম্মদ ইউনুসের নোবেল পুরস্কার পাওনা হয়েছিল। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় এই ব্যাংকের মডেল দেশে দেশে যে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে তা নিশ্চিত বলা যায়। আন্-র্জাতিক সংস্থাগুলোও একের পর এক দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যর্থতার পর শক্ত করে ধরছে ক্ষুদ্রঋণকে। এমডিজি আর পিআরএসপির মডেলে এটি উপযুক্ত পথ হিসেবেই বিবেচিত। কিন্' দারিদ্র্য বিমোচনের পথে এর কী ভূমিকা, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কী বলে? আমাদের আনন্দ-উ"্ছ্বাসের মধ্যে সেটাই এক বড় কাঁটা।

সংবাদ মাধ্যম, গবেষণা জগত আর মধ্যবিত্ত মনোজগতে এনজিও মডেলের আধিপত্য এত বেশি যে, এটি নিয়ে কোন নির্মোহ বিশেষণমুলক আলোচনা কমই হয়। আ"্ছন্নতার মধ্যে ভক্তির সুরই বেশি, আর আছে কিছু নিন্দামন্দ। যাইহোক, ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে খেয়াল করা দরকার।

এক. এর পরিমাণ যেহেতু খুবই কম সুতরাং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রও সীমিত।

দুই. প্রতি সপ্তাহে দেয় কিস্ি- পরিশোধে যোগ করতে হয় গড়ে শতকরা ২০ ভাগ সুদ। ফলে বিনিয়োগ টাকা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে কমপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ লাভসহ উঠে না এলে তা পরিশোধ সম্ভব হয় না। একবার ছেদ পড়ে গেলে যাদের এ ঋণ পাওয়ার কথা সেই গরিব পরিবারের পক্ষে সামাল দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তিন. পরিবারে অন্যকোন আয়ের উৎস না থাকলে দীর্ঘকাল প্রতি সপ্তাহে এ কিস্ি- পরিশোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষত যেকোন বিপর্যয় যদি ঋণ গ্রহীতার আয়-উপার্জনের পথ বাধাগ্রস্- করে, যেমন তার গর" যদি অসুস্থ হয়, ভ্যান বা রিকশা যদি দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্- হয় কিংবা যদি যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোন বাধা আসে তাহলেই তার কিস্ি- পরিশোধ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

চার. এই মডেলে অনুমান করা হয়েছে বাজার প্রক্রিয়া, কাজের সুযোগ, অবকাঠামো, ক্ষমতা কাঠামো সবই অনুকূল। কিন্' বাস্-বে এসব ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিকূল ঘটনা ঋণ গ্রহীতাকে বিপদে ফেলতে পারে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ধস নামাতে পারে এতদিনের গড়ে তোলা ভঙ্গুর চেষ্টায়।

পাঁচ. যদি ঋণ গ্রহীতা বা তার পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে যেহেতু চিকিৎসা ব্যবস্থা উত্তরোত্তর বেসরকারিকরণ ও ব্যয়বহুল হ''ছ সুতরাং এ জন্য পুরনো ঋণ শোধ দুরের কথা তাকে নতুন ঋণের দ্বারস্থ হতে হয়।

ছয়. ক্ষুদ্রঋণ সফলভাবে ব্যবহার হয় শুধু উ''চতর সুদে লগ্নিতে আর কেনাবেচার ব্যবসায়। সে হিসেবে এ ঋণ ঋণের বাজার সম্প্রসারিত করেছে গুণিতক হারে। পরিসেবা খাতে তার ছাপ আছে। উৎপাদনশীল খাতে এর যোগ খুব কম।

এনজিও মডেল নিয়ে সামগ্রিক গবেষণা ছাড়াও আমি গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৫টি গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরীক্ষা করেছি। সেখান থেকে যে সাধারণ চিত্র পেয়েছি তাতে প্রতি ১০০ জনে ৫ জনকে পাওয়া গেছে যারা এই ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। যারা সক্ষম হয়েছেন তাদের সবারই অন্য কোন না কোন আয়ের উৎস আছে। শতকরা প্রায় ৫০ জন একাধিক উৎস থেকে ঋণ নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। আর শতকরা ৪৫ জন একদমই সামাল দিতে পারেননি, তাদের অবস্থা সংকটগ্রস্- হয়েছে। তাদের একটি উলেখযোগ্য অংশ গ্রাম ছেড়েছেন, অনেকে ঋণখেলাপি হিসেবেই। ঢাকা শহরের ফুটপাত বা বস্ি-তে তাদের অনেককে হয়তো পাওয়া যাবে।

মেয়েরা সাধারণত ঋণ গ্রহীতা হিসেবে কথিত। কিন্' আমার সমীক্ষায় দেখেছি এর ব্যবহারকারী শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে পুর''ষ। তারা নারীর নামে গৃহীত ঋণ দিয়ে ব্যবসা করছে; কিন্' এই ঋণ শোধের কোন দায়-দায়িত্ব তাদের নেই। এর ফলে সেসব গ্রহীতা নারীর ওপর মানসিক, সামাজিক ও পারিবারিক চাপ বেড়েছে। বড় আকারের নির্যাতনের ঘটনাও আছে। অনেক ক্ষেত্রে কোন মেয়ের ক্ষুদ্রঋণপ্রাপ্তি একরকম যৌতুক হিসেবে বিবেচিত হয়। কোন কোন অঞ্চলে তাই গ্রামীণ ব্যাংক 'আনঅফিসিয়ালি' পুর''ষদের সঙ্গেই লেনদেন করছে, যদিও কাগজপত্রে কোন না কোন নারীর নাম আছে। কিস্ি- পরিশোধের অনিশ্চয়তার কারণে গ্রামীণ ব্যাংকসহ ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে ঝুঁকছে অধিকতর স''ছল পরিবারগুলোর দিকে, যারা দারিদ্র্যসীমার অনেক ওপরে বাস করে। ঋণ শোধের হার এরপরও উ''চমাত্রায় রাখার জন্য রিসিডিউল করতে হ''ছ বারবার, অর্থাৎ বারবার ঋণ দিয়ে আগের বকেয়া শোধ করতে হ''ছ। রিসিডিউল বাদ দিলে ঋণ পরিশোধের হার ৪০-এর নিচে নেমে আসবে।

দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করলেও সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে বা সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এনজিও কার্যক্রম সবচেয়ে কম দেখা যায়। উত্তরবঙ্গে মঙ্গাপীড়িত

অঞ্চলে পরিচালিত এক গবেষণায় তাই দেখা যা"ছ, এখনও সেখানে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নি"ছ শতকরা ৪০ জন মানুষ, যেখানে সুদের হার শতকরা ২০০ থেকে ৩০০। অগ্রিম ধান ও শ্রম বিক্রি সেখানকার অধিকাংশ মানুষকে দীর্ঘকালের জন্য বন্দি করে ফেলছে। এনজিওরা কেন এখানে ক্ষুদ্রঋণ দিতে আগ্রহী নয়? অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে, তার কারণ এখানকার মানুষ সাপ্তাহিক কিস্ি- পরিশোধে সক্ষম নয়।

তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এনজিও মডেল বিশেষত ক্ষুদ্রঋণকেন্দ্রিক তৎপরতার বিস্-ার অস্বাভাবিক দ্র"ত হারে ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে মুনাফার হার উঁচু, মুলধন সংবর্ধনের হার অনেক বেশি। এর মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রঋণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান কয়টি এখন বৃহদায়তন বাণিজ্যিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকেরও অনেক বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রকল্প এখন। তারা বেশি বেশি করে বহুজাতিক পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হ"ছ। কিন্' ব্যবসা বা মুলধন সংবর্ধনের এ অভাবনীয় সাফল্য এই সত্যকে আড়াল করতে পারে না যে, এনজিও প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা যা ছিল, বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এর ধারাবাহিক ব্যর্থতাতেও এই মডেলের অন্-র্নিহিত সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়া, কনসালট্যান্ট বিদ্বৎসমাজ বা নীতি নির্ধারকরা আগ্রহ দেখান না। কেননা এ মডেলের আ"ছন্নতা মানুষকে দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করছে। **কারণ টিকিয়ে রেখে দারিদ্র্য বিমোচনের পথ অনুসন্ধানই এনজিও মডেলের মুল বৈশিষ্ট্য।** আন্-র্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলো, দেশের শাসক শ্রেণী সবাই তাতে স্বস্ি-বোধ করেন। মুহাম্মদ ইউনুসের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের মানুষের যে সরল আনন্দ-উ"ছ্বাস তাকে অবলম্বন করে এ চেষ্টা আরও বাড়বে। বাড়াতে চেষ্টা করবে অসরল ক্ষমতাবান দেশী-বিদেশী লোকজন।

ড. আনু মুহাম্মদ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়